بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ২৬ জুন, ২০২৬ মোতাবেক ২৬ এহসান, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনেও আমরা দরিদ্রদের প্রতিপালন এবং দানশীলতা ও বদান্যতার অনেক ঘটনা দেখতে পাই। আর কেবল তাঁর দাবির পর থেকেই নয়, বরং তাঁর জীবনের প্রারম্ভিক যুগে এবং যৌবনকালেও আমরা তাঁর উন্নত নৈতিকতার ঘটনাবলি দেখতে পাই। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (আ.) যে মায়ের কোলে লালনপালন করেছেন, আমরা যখন তাঁর (মায়ের) জীবনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন তাঁর মাঝেও দরিদ্রদের প্রতিপালন এবং দানশীলতা ও বদান্যতার বিভিন্ন ঘটনা দেখতে পাই। যেন তিনি এমন এক মায়ের কোলে লালিতপালিত হয়েছেন যিনি তাঁকে উত্তম চরিত্রও শিক্ষা দিয়েছেন, আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং যেখানে তাঁর প্রকৃতিতে পুণ্য সৃষ্টি করেছেন, সেখানে তিনি তাঁর মায়ের পক্ষ থেকেও পুণ্যময় পরিবেশ লাভ করেছিলেন। বস্তুত, তাঁর মায়ের এই দানশীলতা ও বদান্যতার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন,

হযরত মাঈ চেরাগ বিবি সাহেবা, অর্থাৎ হযরত আকদাস (আ.)-এর শ্রদ্ধেয়া মায়ের পরিবার, হুশিয়ারপুর জেলার আয়মা গ্রামের একটি সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত মোগল পরিবার ছিল। তাঁর প্রকৃতিতে দানশীলতা এবং আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্য কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল। একজন সতীসাধ্বী ও মহীয়সী নারীর মাঝে যেসব উন্নতমানের গুণাবলি থাকা উচিত, তা তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল। তিনি সর্বদা প্রফুল্ল ও গাম্ভীর্যপূর্ণ অবস্থায় থাকতেন। আতিথেয়তার জন্য তাঁর হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল আবেগ এবং বড়ো মন ছিল। যেসব মানুষ তাঁর দানশীলতা এবং আতিথেয়তা দেখেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও জীবিত আছেন। *যখন হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) এটি লিখেছেন* তিনি বর্ণনা করেন, তারা এখনো বেঁচে আছেন। তিনি (রা.) বর্ণনা করছেন, তাঁকে যদি বাহির থেকে এই সংবাদ দেওয়া হতো যে, চারজন মানুষের জন্য খাবার প্রয়োজন, চারজন অতিথি এসেছেন, তখন ভেতর থেকে খাবার পাঠানোর সময় তা আটজনেরও বেশি মানুষের জন্য পাঠানো হতো, যেন আরও কেউ এসে পড়লে বা সাথে বসে থাকলে তারাও খেতে পারেন; আর অতিথিদের আগমনে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। এরপর তিনি লেখেন, তিনি নিজের শহরের দরিদ্র ও দুর্বলদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন এবং তাঁর দৈনন্দিন রুটিনের একটি বিশেষ দিক ছিল, দরিদ্র মৃত ব্যক্তিদের কাফনের কাপড় তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যেত। *যদি কোনো গরিব মানুষ মারা যেত, তাহলে তিনি তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতেন।* মোটকথা, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদেরকে সাহায্য করার কারণে তিনি সবার কাছে একপ্রকার স্নেহময়ী মায়ের মতো ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তরবিয়ত বা লালনপালনে তাঁর শ্রদ্ধেয়া মায়ের এই গুণাবলি এবং নৈতিকতা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং যেহেতু তিনি (আ.) একটি বিশাল পরিবারের অধিকারী হতে যাচ্ছিলেন, তাই আল্লাহ্ তা'লা শুরু থেকেই এসব উন্নতমানের গুণাবলি সৃষ্টির জন্য তাঁর নিমিত্তে এই ব্যবস্থা করেছিলেন যে, তাঁকে এমন এক স্নেহময়ী

মাতার কোলে রেখেছিলেন যিনি সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি, আতিথেয়তা এবং দানশীলতা ও বদান্যতায় ছিলেন অতুলনীয়। এভাবে যেন তিনি (আ.) এসব গুণাবলি মায়ের দুধের সাথে পান করেছিলেন। অমুখাপেক্ষিতা, বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং স্পষ্টবাদিতার গুণাবলি তিনি তাঁর পিতা মহোদয়ের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন, আর আতিথেয়তা, দানশীলতা, বদান্যতা ও সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি তিনি তাঁর মাতা মহোদয়ার কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

যৌবনকালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দানশীলতা ও বদান্যতার যেসব ব্যক্তিগত ঘটনা পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে হযরত মিয়াঁ আল্লাহ্ ইয়ার সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, যে সময় হুযূর (আ.) সিয়ালকোটে চাকরি করতেন, তখন একবার হুযূরের জন্য হুযূরের মাতা দুটি পোশাক অর্থাৎ দুজোড়া কাপড় এবং কিছু পিন্নি (বা মিষ্টান্ন) মঙ্গল নামক এক নাপিতের মাধ্যমে পাঠান। *মঙ্গল নাপিতের মাধ্যমে পাঠান। ফেরত* আসার সময় মঙ্গল আমাদের গ্রাম দিয়ে যাচ্ছিল; *মিয়াঁ আল্লাহ্ ইয়ার সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, তখন সে আমাদের গ্রাম দিয়ে যাচ্ছিল।* সে আমাদেরকে বলেছে, আমি যখন এসব জিনিস নিয়ে সিয়ালকোটে যাই এবং হুযূরের সামনে রাখি, তখন হুযূর (আ.) বলেন, তোমার ভাগে যা পড়ে তা তুমি নিয়ে নাও, আর আমার ভাগ আমাকে দাও। আমি বলি, হুযূর! এগুলো আপনার জন্য। আম্মাজান *অর্থাৎ আপনার মা* আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, তুমি এতদূর থেকে কষ্ট করে এগুলো বয়ে এনেছ, তুমি অবশ্যই তোমার অর্ধেক ভাগ নিয়ে নাও। যাহোক, আমাকে একটি পোশাক অর্থাৎ এক জোড়া কাপড় এবং কিছু পিন্নি দিয়ে দেন এবং বলেন, আম্মাজানকে গিয়ে বলবে, তিনি যেন আমাকে এখান থেকে দ্রুত ফেরত নিয়ে যান। আমার এখানে মন টিকছে না। লোকেরা অন্যায় কাজে জীবন অতিবাহিত করে এবং তাদের দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হয়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) হযরত সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওয়ালীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেবের বরাতে বর্ণনা করেন, আমি যখন সিয়ালকোটে ছিলাম, সেখানে আমার ফযল দ্বীন সাহেবের কন্যা মাঈ হায়াত বিবি সাহেবার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়, যিনি হযরত কারী হাফেয মুহাম্মদ শফী সাহেবের শ্রদ্ধেয়া মাতা। মাঈ সাহেবা বলেন, প্রথমে মির্যা সাহেব এই মহল্লারই একটি চিলেকোঠায় থাকতেন, যা ঝান্ডাওয়ালা মহল্লায় অবস্থিত আমাদের বর্তমান বাড়ির সাথে সংলগ্ন। যখন সেই ঘরটি ভেঙে পড়ে, তখন মির্যা সাহেব কাশ্মীরী মহল্লায় অবস্থিত আমার পিতার বাড়িতে চলে আসেন। তিনি বলেন, যখন তিনি আমাদের বাড়িতে আসেন তখন আমি লক্ষ করি, তিনি বাড়িতে কারো সাথে মেলামেশা করতেন না। এছাড়া তিনি একথাও বলেন, মির্যা সাহেব যে বেতন পেতেন তা মহল্লার বিধবা ও অভাবীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন, তাদের কাপড় বানিয়ে দিতেন বা নগদ অর্থ দিয়ে দিতেন এবং নিজের জন্য কেবল খাবারের খরচটুকু রেখে দিতেন।

হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, দানশীলতা ও বদান্যতা সম্পর্কে আমরা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি এবং আমাদের সামনে সংঘটিত এসব ঘটনা ও অবস্থার প্রতি লক্ষ করি তখন বুঝতে পারি, তাঁকে এই মহান চরিত্রের এক বিশাল অঙ্ক প্রদান করা হয়েছিল এবং এই আচরণ তাঁর জীবনচরিতে সেই সময় থেকেই পাওয়া যায় যখন থেকে তিনি বুঝতে শিখেছিলেন, একেবারে শৈশব এবং যৌবনকাল থেকেই। এমনটি নয় যে, প্রত্যাদিষ্ট হবার পর কোনো কৃত্রিমতার কারণে তাঁর দ্বারা এ ধরনের নৈতিক গুণাবলির প্রকাশ ঘটত, বরং এটি তাঁর স্বভাব বা প্রকৃতির একটি অঙ্ক ছিল। এ

ধরনের নৈতিকতা কখনও কখনও সম্পূর্ণ গোপন থাকত এবং মাঝে মাঝে ঘটনাচক্রে এমনভাবেও এর প্রকাশ ঘটত যেন অন্যরা জানতে পারে। তাঁর সহজাত প্রবণতা ছিল, এটি যেন গোপন থাকে; তিনি কোনো পুণ্য করলে তা যেন গোপন থাকে। তাই তাঁর জীবনের প্রারম্ভিক সময়ের দানশীলতা ও বদান্যতার ঘটনাগুলো সাধারণত গোপনই থাকত। কারণ তিনি একজন নির্জনতাপ্রিয় মানুষ ছিলেন এবং সেই সময়ের অবস্থানুসারে তিনি গোপনে কিছু মানুষের সাথে সদাচরণ করতেন বা তাদেরকে সাহায্য করতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁকে জনসমক্ষে আনেন, প্রত্যাদিষ্ট করেন এবং ব্যাপকহারে মানুষের যাতায়াত আরম্ভ হয় আর তাঁর অবস্থা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে, তখন এসব ঘটনা প্রত্যক্ষকারী এবং বর্ণনাকারীদেরও জন্ম হয়। তিনি (রা.) লেখেন, হুযূর (আ.) কোনো অভাবী বা যাচককে কখনও খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। তাঁর জীবন وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (সূরা আদ-দুহা: ১১) 'আর সাহায্যপ্রার্থীর বিষয়ে নির্দেশনা হলো, তুমি তাকে ভর্ৎসনা কোরো না'– এর এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ছিল।

হযরত মওলানা আব্দুল করীম সাহেব বলেন, একদিন এমন হলো যে, আসরের নামাযের পর তিনি (আ.) নিয়মানুযায়ী ওঠেন এবং মসজিদের খিড়কি দরজা দিয়ে ভেতরে যাবার জন্য পা রাখেন। এমন সময় একজন সাহায্যপ্রার্থী আস্তে করে বলে, আমি অভাবগ্রস্ত। হুযূরের (আ.) তখন একটি জরুরি কাজও ছিল এবং সেই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর অন্য মানুষের আওয়াজের সাথে কিছুটা মিশে গিয়েছিল, অর্থাৎ যারা নামাযের পর উঠেছিল এবং স্বভাবতই নিজেদের মধ্যে কোনো না কোনো কথা বলছিল। বস্তুত, হুযূর (আ.) অবচেতনভাবেই ভেতরে চলে যান; অর্থাৎ নিজের অজান্তেই মনোযোগ না দিয়ে ভেতরে চলে যান। আওয়াজ যদি হালকাভাবে কানে গিয়েও থাকে, যেহেতু তাঁর মস্তিষ্কে অন্য কোনো কাজের ব্যস্ততা ছিল, তাই মনোযোগ দেন নি এবং চলে যান আর ভ্রূক্ষেপ করেন নি। কিন্তু যখন তিনি নীচে যান, তখন কানে আসা সেই ধীর কণ্ঠস্বর তাঁর হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ ভেতরে গিয়ে তাঁর আবার অনুভূতি হয় যে, আমি এমন একটি আওয়াজ শুনেছিলাম; কেউ বলেছিল– 'আমি অভাবগ্রস্ত'। তাঁর হৃদয়ে এর গভীর প্রভাব পড়ে। তিনি দ্রুত ফিরে আসেন এবং খলীফা নূরুদ্দীন সাহেবকে ডেকে বলেন, একজন সাহায্যপ্রার্থী ছিল, তাকে খোঁজো। সাহায্যপ্রার্থী ছিল, কোথায় গেল? সেই সাহায্যপ্রার্থী তিনি (আ.) চলে যাবার পর চলে গিয়েছিল। খলীফা সাহেব অনেক খোঁজাখুঁজি করেন, কিন্তু কোনো সন্ধান পান নি। এই খলীফা নূরুদ্দীন সাহেব কাশ্মীরের এক ভদ্রলোক ছিলেন। যাহোক, তিনি বলেন, সন্ধ্যায় স্বভাবানুযায়ী নামায পড়ে বসলে সেই সাহায্যপ্রার্থী আবার আসে এবং কিছু চায়। হুযূর (আ.) খুব দ্রুত পকেট থেকে কিছু বের করেন এবং তার হাতে রেখে দেন; আর তখন মনে হয় তিনি এতটা আনন্দিত হয়েছেন, যেন তাঁর ওপর থেকে কোনো বোঝা নেমে গেছে। কয়েক দিন পর তিনি (আ.) বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, সেদিন যখন যে ওই সাহায্যপ্রার্থীকে পাওয়া যায় নি, তখন আমার হৃদয়ে এমন এক বোঝা ছিল যা আমাকে ভীষণ অস্থির করে রেখেছিল আর আমি ভয় পাচ্ছিলাম, আমার দ্বারা কোনো পাপ হয়ে গেছে, কারণ আমি সাহায্যপ্রার্থীর দিকে মনোযোগ দিই নি এবং এভাবে দ্রুত ভেতরে চলে গিয়েছিলাম। আল্লাহ্ তা'লার কাছে শুকরিয়া যে, সে সন্ধ্যায় ফিরে এসেছিল; অন্যথায় খোদা জানেন, আমি কত না অস্থিরতায় থাকতাম! আর আমি দোয়ায়ও করেছিলাম যেন আল্লাহ্ তা'লা তাকে ফিরিয়ে আনেন।

একইভাবে হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব নিজ সীরাত গ্রন্থে এক স্থানে লেখেন, কাদিয়ানের কাছাকাছি সাঠিয়ালী নামের একটি ছোটো গ্রাম রয়েছে, যা কাদিয়ান থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। সেখান থেকে এক জাঠ ফকির আসত; তাকে দেখেছে– এমন বহু লোক এখনও বর্তমান আছে। সে মসজিদে মোবারকের ছাদের নীচে এসে সেই জানালার কাছে আওয়াজ দিত, যা বায়তুল ফিকরের পশ্চিম দেয়ালে অবস্থিত। সে ডাক দিয়ে বলত, গোলাম আহমদ! এক রুপি নেব; আর সে সেখানে বসে পড়ত। হযরত সাহেব (আ.) মাঝে মাঝে কোনো কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং তাঁর মনোযোগ সেই কাজের প্রতি নিবদ্ধ থাকত। তিনি তার ডাক শুনতে পেতেন না, ফলে সে কিছুক্ষণ পরপর ডাক দিত। বেশিরভাগ মানুষের কাছে এটি অপছন্দনীয় মনে হতো যে, সে এখানে বসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কেন বিরক্ত করছে! আর কেউ তাকে বারণ করলে সে বলত, আমি কি তোমাদের কাছে এসেছি? আমি তো গোলাম আহমদ (আ.)-এর কাছে চাইছি। হযরত আকদাসের কাছে যদি এ খবর পৌঁছত যে, কেউ তাকে কিছু বলেছে, তবে তিনি তা অপছন্দ করতেন এবং হাসতে হাসতে তাকে রুপি দিয়ে দিতেন। আর তাঁর এই নিয়মও ছিল যে, তিনি কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে বেশিক্ষণ অপেক্ষায় রাখতেন না।

হযরত চৌধুরী আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব বর্ণনা করেন, একবার প্রাতঃভ্রমণ থেকে ফিরে এসে হুযূর (আ.) যখন বাড়িতে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন, তখন লেংটি পরিহিত এক দরবেশ ডাক দেয়। সে ফকির ছিল। কেউ কেউ এমন পোশাক পরে যেন তাদের কাছে কোনো পোশাক নেই; এটাই তাদের মতে আধ্যাত্মিক সাধনা হয়ে থাকে। যাহোক, তিনি বলেন, সে ডাক দিয়ে বলে, দাতা, দাতা! কিছু দাও। হুযূর (আ.) বলেন, আল্লাহ্ই দাতা; একথা বলে তিনি ভেতরে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ সে (হুযূরকে) দাতা বলেছিল; হুযূর (আ.) বলেন, আল্লাহ্ই দাতা। সে আবার ডাক দেয়, দাতা তো আল্লাহ্ই, আপনি কিছু দিয়ে দিন। হুযূর (আ.) তার জন্য কিছু পাঠিয়ে দেন। যাহোক, তাঁর এই কথায় তার কী-ই বা তরবিয়ত হতো, কিন্তু এই কথার মাধ্যমে তিনি (আ.) নিজ অনুসারীদের এই শিক্ষা প্রদান করেন যে, আমাদের কথাবার্তায় শিরকের লেশমাত্রও থাকা উচিত নয়।

হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, একদা একজন ভিক্ষুক আসে। সে কাদিয়ানে ঘুরে বেড়াতে থাকে। সে সকালে উঠত এবং মরহুম হযরত মীর হামিদ শাহ সাহেবের কবিতা পড়ত। ঘুরে বেড়ানোর অর্থ হলো, সে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে এই কবিতার চরণগুলো আবৃত্তি করত:

খোদা তোমার সাহায্যকারী হয়েছেন, হে আমার কাদিয়ানবাসী!
তুমি আমাদের নিরাপত্তা দান করেছ, হে দারুল আমানবাসী!

যাহোক, সে এটি পড়ত এবং মাঝে মাঝে এর সাথে এটিও পড়ত:

সকল দিকে চিন্তা প্রসারিত করে ক্লান্ত-শ্রান্ত হলাম আমরা

সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কবিতা পড়ত। সে সমগ্র কাদিয়ান চক্কর দিত। যখন সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয় কবিতাটি পড়ত, তখন হযরত মাখদুমুল মিল্লাত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.)-র কাছে তা অত্যন্ত অসহনীয় লাগত। তিনি বলতেন, সে এই কবিতার যোগ্য নয়। কারণ, এই কবিতাটি এক বাস্তব সত্য এবং (আধ্যাত্মিক) অবস্থা; *এর মধ্যে ব্যাপক গভীরতা রয়েছে;* যা কেবল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্তাতেই পাওয়া যায়। *এই কবিতায় যে আধ্যাত্মিক অবস্থা ও বাস্তবতা বর্ণনা করা হয়েছে, তা তো সাধারণ মানুষের মধ্যে হতেই পারে না।* এই কবিতায় যা কিছু বর্ণনা

করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি বলতেন, (মসীহ্ মওউদের জন্য) আত্মাভিমানের কারণে আমি এটি অন্য কারো মুখ থেকেই শুনতে পারি না, সেখানে এই ধরনের সাধারণ একজন ভিক্ষুক তা পড়ে বেড়াবে! একজন সাধারণ মানুষ বা ফকির এই ধরনের কবিতা পড়বে– এতে মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের খুব রাগ হতো। যাহোক, তিনি বলেন, এটি তো মাখদুমুল মিল্লাতের সেই ভালোবাসা ও প্রেমের অবস্থা, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁর ছিল।

একবার সেই ভিক্ষুক কাদিয়ানে চক্কর দেয়। তখন রমযান মাস ছিল। এই সময়ের মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে একাধিকবার অনেক কিছু দিয়েছিলেন, কিন্তু সে বলত, আমার থালা ভরে দিন! ঈদের দিন সে অনেক বড়ো একটি থালা নিয়ে উপস্থিত হয় এবং মসজিদে দরজার কাছে চাদর বিছিয়ে বসে পড়ে। আর যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আগমন করেন তখন সে আবেদন করে, আমার থালা ভরে দিন। হযরত আকদাস (আ.) তাতে একটি টাকা রাখেন। তাঁর এই টাকা রাখার সাথে সাথেই যেন টাকার বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের মুদ্রায় তার থালা ভরে দেওয়া হয়। যখন হযরত সাহেব (আ.) তার আবেদন শোনেন তখন তিনি মৃদু হাসেন এবং এই অবস্থায় টাকাটি দেন। যাহোক, তাঁর দেবার পর তাঁর মান্যকারীরাও কিছু না কিছু মুদ্রা দিয়ে তাকে সাহায্য করেন এবং এভাবে তার থালা ভরে যায়।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, হুযূর (আ.) যখন ১৯০৫ সালে শেষবারের মতো দিল্লী গিয়েছিলেন, তখন একদিন তিনি দিল্লীর মাযার ইত্যাদি দর্শনের উদ্দেশ্যে বের হন। কেউ একজন নিবেদন করে, হুযূর! এদিকে রাস্তায় এত বেশি ভিক্ষুক থাকে যে, পথ চলা কঠিন হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, আজ আমরা যাব, আমরা সবাইকে দেবো; যতজন ভিক্ষুক বসে আছে, আমরা সবাইকে দেবো। এটি কোনো সাধারণ সংকল্প ও সাহসের বিষয় ছিল না; তিনি (আ.) বাস্তবে এই বিষয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন যে, যে-ই চাইবে তাকেই তিনি দেবেন। যে বিপুল সংখ্যায় ভিক্ষুক থাকার কথা বলা হয়েছিল ততটা অবশ্য পাওয়া যায় নি, তবে কয়েকজন পাওয়া গিয়েছিল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবেদনের ফল বাস্তব রূপে লাভ করেছিল। অর্থাৎ যতজনকেই পাওয়া গিয়েছিল, তিনি (আ.) প্রত্যেককে সাহায্য করেছিলেন।

হযরত হাফেয আহমদুল্লাহ্ নাগপুরী সাহেব (রা.) বলেন, একদিন হুযূর (আ.) গোল কামরায় উপবিষ্ট ছিলেন। প্রায় বিশ বা পঁচিশজন লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হুযূর (আ.) কোনো বিষয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন, এমন সময় একজন ফকির আসে এবং উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষা চায়। তিনি বলেন, এটি আমার কাছে খুব বিরক্তিকর মনে হয় যে, সে হুযূর (আ.)-এর কথা বলার মাঝে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে; তিনি (আ.) কথা বলছেন আর সে হস্তক্ষেপ করছে! আমি দরজা বন্ধ করে দিই। আমি উঠে দরজা বন্ধ করে দিলাম। হুযূরের (আ.) দৃষ্টি সেদিকে পড়ে। তিনি (আ.) তাঁর বক্তৃতা বন্ধ করে আমাকে বলেন, যাও, উঠে ভিতরের দরজায় কড়া নেড়ে এই ভিক্ষুককে ভেতর থেকে কিছু দেওয়ানোর ব্যবস্থা করো। অর্থাৎ তিনি বলেন, দরজা কেন বন্ধ করেছ? এখন তুমি যাও, ঘরের ভেতর আওয়াজ দাও এবং সেখান থেকে কিছু নিয়ে এই ভিক্ষুককে দাও। আর ঘর থেকে আনিয়ে তারপর তিনি (আ.) তাকে সাহায্য করেন। আর তিনি বলেন, এমনটি করা মোটেই ভালো নয় যে, ভিক্ষুকের আবেদন শুনে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এটি অত্যন্ত ভুল কাজ যে, ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইবে আর তোমরা দরজা বন্ধ করে দেবে।

হযরত বাবু গোলাম মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একজন সারেঙ্গীবাদক গায়ক হুযূর (আ.)-এর কাছে ভিক্ষুক হিসেবে তাঁর ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হয়। হুযূর (আ.) তাকে একটি সিকি (চার আনা) দেন। এমন সময় মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.) সেখানে চলে আসেন। হযরত সাহেব (আ.) এর মধ্যেই ভেতরে চলে গিয়েছিলেন। মীর সাহেব তাকে দেখে সারেঙ্গী বাজানোর কারণে খুব বকাবকি করেন এবং বলেন, খবরদার! আর কখনও যদি এখানে এসেছ!

পরের দিন সে আবারও চলে আসে। হযরত সাহেব (আ.) তাকে দেবার জন্য বাইরে এসে দেখেন, ভিক্ষুক সেখানে নেই। সে হয়ত মীর সাহেবকে দেখতে পেয়েছিল। তার মীর সাহেবের গতদিনের বকুনির কথা মনে ছিল, তাই সে সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। তখন তিনি (আ.) একজনকে বলেন, যাও, সেই সারেঙ্গীবাদক ভিক্ষুককে খুঁজে দেখো, সে কোথায় গেছে। কেউ একজন বলে, হুযূর, সে তো পালিয়ে গেছে। তিনি (আ.) বলেন, যাও, তুমিও দৌড়ে গিয়ে তাকে ডেকে আনো। যাহোক, সে আসে এবং মীর সাহেবকে দেখে ভয় পায়। তখন হযরত সাহেব (আ.) মীর সাহেবকে বলেন, মীর সাহেব, এই বেচারা কী করবে, তার তো আর কোনো পেশা জানা নেই। সে কোনো কাজই জানে না, সে কী করবে? সারেঙ্গী বাজায়, বাদ্যযন্ত্র বাজাতে থাকে। আপনি তাকে কোনো পেশা শিখিয়ে দিন, কোনো কাজ তাকে শিখিয়ে দিন, তাহলে সে আর এটি বাজাবে না। তার জন্য কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিন।

তারপর সেই গায়ককে একান্তে ডেকে তিনি (আ.) বলেন, যতদিন তুমি এখানে থাকবে, সারেঙ্গী বাজাবে না। মীর সাহেব মার দিয়ে বসতে পারেন। *তাঁর রাগ ওঠে, পাছে তোমাকে মেরেই বসেন! তোমাকে হয়ত দু-এক চড়ই লাগিয়ে দেবেন।* যাহোক, তুমি এখানে বাদ্যযন্ত্র বাজাবে না। চুপিসারে দরজার শিকল বা কড়া নেড়ো, আমি তোমাকে কিছু না কিছু দিয়ে দেবো। ফলে যতদিন সে কাদিয়ানে ছিল, প্রতিদিন চার আনা করে নিয়ে যেত।

হযরত সৈয়দ ফযল শাহ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একজন ফকিরের অভ্যাস ছিল, হযরত সাহেব (আ.)-এর কাছে এসে সে কখনও বলত এক আনা দিন, কখনও বলত দুই আনা, কখনও বা আট আনা; মোটকথা সে নির্দিষ্ট করে কিছু না কিছু চাইতই। হযরত সাহেব (আ.) যদি কোনো কাজে বা কথায় ব্যস্তও থাকতেন, সে বার বার বলতে থাকত এবং নিয়েই ছাড়ত; সে কখনোই পিছু ছাড়ত না। পরবর্তীতে হযরত সাহেব (আ.) তার স্বভাব সম্পর্কে বেশ ভালোভাবে অবগত হয়ে গিয়েছিলেন। যখন সে আসত এবং যত টাকা চাইত, তিনি (আ.) তাকে ঠিক ততটাই দিয়ে দিতেন এবং বলতেন, সে তো এতটুকু না নিয়ে নড়বেই না। সে যতটুকু চায়, তাকে ততটুকুই দিয়ে দাও।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, আমি ১৮৯৮ সাল থেকে স্থায়ীভাবে হুযূর (আ.)-এর সমীপে চলে আসি এবং ১৮৯২ সাল থেকে কাদিয়ানে যাতায়াত করতাম। আমার সামনে অনেকেই ভিক্ষা চেয়েছে, কিন্তু আমি হযরত সাহেব অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কখনও দেখি নি যে, তিনি (আ.) কোনো ভিক্ষুককে তামার মুদ্রা অর্থাৎ পয়সা দিয়েছেন। তিনি (আ.) ভিক্ষুককে সর্বদা রূপার মুদ্রাই দিতেন। তৎকালীন মুদ্রার প্রচলন অনুযায়ী তামার মুদ্রা ছিল এক পয়সা, দুই পয়সা বা আধা আনা পর্যন্ত। আর রূপার মুদ্রা হতো এক আনা, দুই আনা বা তার চেয়ে বড়ো মুদ্রা। এগুলো চার আনা (সিকি) ইত্যাদির সমমূল্যের হতো। যদিও সে যুগে এক পয়সা ও দুই পয়সারও যথেষ্ট মূল্য ছিল, তবুও তিনি

(আ.) এক আনা, দুই আনা বা তার চেয়েও বেশি দান করতেন, যা একটি বেশ ভালো অঙ্কের অর্থ ছিল। আর সাধারণত একজন সামান্য ভিক্ষুককেও তিনি এক টাকা দিয়ে দিতেন।

একজন অআহমদী ফকির একবার হুযূরের সমীপে এসে আবেদন করে, আমি জঙ্গলে একটি কূপ খনন করতে চাই। সেখানে মুসাফিররা এর মাধ্যমে আরাম পাবে এবং তারা পানি পান করবে। তিনি বলেন, হযরত সাহেব (আ.) তাকে এই উদ্দেশ্যে দুইশ টাকা দিয়ে দেন ও বলেন, তুমি তো মানুষের সেবার জন্যই এই কাজ করছ; যাও, কূপ খনন করো, আমি তোমাকে টাকা দিচ্ছি। তিনি (আ.) জামা'তকে মানবসেবার যে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়েছেন, তার বাস্তব দৃষ্টান্তও তিনি নিজেই স্থাপন করে দেখিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত আব্দুস সামী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মিয়া শরীফ আহমদ সাহেবের আকীকা ছিল এবং অতিথিশালায় সব অতিথি খাবার খাচ্ছিলেন। জীবিত পুত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন তাঁর (আ.) তৃতীয় পুত্র। পরবর্তীতে আরও সন্তান জন্মগ্রহণ করে মারাও গিয়েছেন, কিন্তু হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব, যিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন, তাঁরই আকীকা ছিল। লোকজন খাবার খাচ্ছিল, হুযূরও (আ.) সাথে শামিল ছিলেন। এমন সময় একজন ফকির অতিথিশালার ভেতরে ভিক্ষা চাইতে চলে আসে। লোকেরা তাকে বের করে দিতে উদ্যত হয়। হুযূর (আ.) নিজে সেই ফকিরের হাতে খাবার তুলে দেন এবং ফকিরটিকে ধমকাতে লোকজনদের বারণ করেন। (তিনি বলেন,) সে যদি খাবার খেতে এসে থাকে তবে তাকে ধমকাবে না। তিনি নিজে প্লেটে তুলে তাকে খাবার দিয়ে দেন।

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলভী (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক মৌলভী কাদিয়ানে আসে এবং হুযূর (আ.)-এর সাথে বিতর্ক শুরু করে। অতঃপর হুযূর (আ.) যখন তাকে উত্তর দেওয়া শুরু করেন, তখন সে চুপ হয়ে যায়। ঈসা (আ.)-এর জীবন-মৃত্যু সংক্রান্ত আলোচনা হচ্ছিল এবং এটি প্রাথমিক যুগের ঘটনা। তিনি (আ.) যখন তাকে বোঝান এবং সে চুপ করে থাকে, তখন তিনি (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি যে যুক্তিগুলো দিয়েছি তা সঠিক কি না– আপনি কি তা বুঝতে পেরেছেন? সে বলে, জি, আমি বুঝতে পেরেছি; কিন্তু সে অত্যন্ত ধৃষ্টতার পরিচয় দেয়। সে বলে, আমি বুঝতে পেরেছি যে, আপনি দাজ্জাল! (নাউযুবিল্লাহ্)। কারণ দাজ্জালের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, সে বিতর্কে অন্যদের মুখ বন্ধ করে দেবে, অর্থাৎ নিরুত্তর করে দেবে। তখন তিনি (আ.) আর কিছু বলেন নি এবং সে চলে যায়। অমৃতসরে গিয়ে সে একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপায় এবং তাতে এই ঘটনাটি বর্ণনা করে যে, আমি এই কথাগুলো বলেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি (আ.) যখন ভেতরে চলে যান, তখন আমি একটি চিরকুট পাঠাই যে, আমি অভাবগ্রস্ত। এখন দেখুন, এখানে সে নিজেই নিজের আত্মমর্যাদাহীনতার প্রকাশ ঘটাচ্ছে এবং হুযূর (আ.)-এর সদ্ব্যবহারেরও প্রকাশ নিজেই করছে। সে বলে, আমি চিরকুট পাঠাই যে, আমি অভাবগ্রস্ত, আমার সাথে সদাচরণ করা উচিত। যদিও আমি আপনাকে অত্যন্ত কটু কথা বলেছি, কিন্তু যাহোক আমি অভাবগ্রস্ত, আমার সাথে সদ্ব্যবহার করুন। তিনি (আ.) সাথে সাথে পনেরো টাকা পাঠিয়ে দেন। সে লেখে, তিনি (আ.) সাথে সাথে আমাকে পনেরো টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন; তিনি অত্যন্ত দানশীল, আর তাঁর মুখের ওপর কটু কথা বলা হলেও তিনি রুষ্ট হন না। তিনি (আ.) স্বয়ং এই শেষ বিষয়টি, অর্থাৎ পনেরো টাকা পাঠানোর কথা কারো কাছে উল্লেখ করেন নি; কিন্তু তার এই বিজ্ঞপ্তি থেকে মানুষ জানতে পারে, তার কঠোর বাক্যবাণ সত্ত্বেও তিনি (আ.) তাকে পনেরো টাকা পাঠিয়েছিলেন।

হযরত কাজী আব্দুল গফুর সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৯০৬ সালে আমি আমার বড়ো ভাই হাফেয মুরাদ বখশ সাহেবের সাথে রাওয়ালপিন্ডি থেকে কাদিয়ানে যাই। হুযূর (আ.) মসজিদের সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। এক ব্যক্তি, সম্ভবত রাওয়ালপিন্ডির বাসিন্দা হেকিম শাহনেওয়াজ সাহেব, হুযূর (আ.)-কে একটি থলিতে সতেরো পাউণ্ড নযরানা (উপঢৌকন) দেন। হুযূর (আ.) সেই থলেটি নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দেন। নীচে একজন ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে ছিল, সে সাহায্য চায়। হুযূর সেই থলেটি পকেট থেকে বের করে তার হাতে দিয়ে দেন। উল্লিখিত হেকিম সাহেব যখন হুযূরকে এমনটি করতে দেখেন তখন নিবেদন করেন, হুযূর! ওই থলেতে সতেরো পাউন্ড ছিল। তিনি (আ.) বলেন, এটি তার ছিল; তার কাছেই পৌঁছে গেছে। এরপর তিনি নীরব হয়ে যান। সেই যুগেও এক পাউন্ডের অনেক মূল্য ছিল; এক পাউন্ডে ভারতীয় পনেরো রুপি পাওয়া যেত, অর্থাৎ সে যুগে এটি বিশাল অঙ্কের অর্থ ছিল; (সতেরো পাউন্ডের) সর্বমোট ২৫৫ রুপি হয়। কেননা তখন মাত্র দুই পয়সাতেই রুটি ও খাবার পাওয়া যেত।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, দান-সদকা করা হুযূরের নৈমিত্যিক অভ্যাস ছিল। সাধারণত তাঁর রীতি ছিল, তিনি (আয়ের) এক দশমাংশ সদকা দিয়ে দিতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.)-র একটি রেওয়ায়েত হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন, আমার কাছে শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান বর্ণনা করেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অনেক বেশি সদকা দিতেন। সাধারণত তিনি এত গোপনে দান করতেন যে, আমরাও তা জানতে পারতাম না। অধম জানতে চায়, (তিনি) কী পরিমাণ সদকা দিতেন? আম্মাজান বলেন, অনেক দিতেন, কিন্তু জীবনের শেষ দিনগুলোতে (তাঁর কাছে) যত অর্থ আসত তার এক-দশমাংশ তিনি সদকার জন্য পৃথক করে রাখতেন এবং সেখান থেকেই দিতে থাকতেন।

আম্মাজান আরও বলেন, এর অর্থ এমন নয় যে, (তিনি) এক-দশমাংশের চেয়ে বেশি দান করতেন না। বরং তিনি বলতেন, অনেক সময় বিভিন্ন খরচ বেড়ে যায়, (যেমন) অতিথি আসছে, লঙ্গরখানার ব্যয় রয়েছে, আরও অন্যান্য খরচ রয়েছে। তখন মানুষ সদকা দিতে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। কিন্তু যদি শুরুতেই সদকার টাকা পৃথক করে রাখা হয়, তাহলে আর সেই আলস্য হয় না। কারণ তখন সেই টাকা অন্য কোনো কাজে ব্যয় করা যায় না। আম্মাজান বলেন, এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর কাছে আসা মোট অর্থের এক-দশমাংশ আগে থেকেই পৃথক করে রাখতেন, নতুবা তিনি তো এর চেয়েও বেশি দান-সদকা দিতেন। এরপর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন, আমি এটি আম্মাজানকে জিজ্ঞেস করি, তিনি (আ.) কি সদকা দেবার সময় আহমদী ও অআহমদীর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করতেন? আম্মাজান বলেন, না! তিনি কখনো এটি দেখতেন না যে, কে আহমদী আর কে অআহমদী। অভাবী হলেই তাকে সাহায্য করতেন।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, যেমনটি হুযূরের অভ্যাস ছিল, সাহায্যপ্রার্থীকে তিনি কখনো খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না আর যেভাবে না চাইতেও তিনি অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করতেন, তেমনিভাবে এটিও তাঁর অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, মানুষের চাওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিতও তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন এবং এমন পরিস্থিতিতেও তিনি উদারভাবে দান করতেন। সাহেবযাদা সিরাজুল হক সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক ব্যক্তি হুযূর (আ.)-এর জন্য একটি অত্যন্ত সুন্দর টুপি পাঠিয়েছিল। যখন সেই পার্সেলটি হুযূরের নিকট পৌঁছে, ঘটনাক্রমে সেখানে একজন হিন্দুও উপস্থিত ছিল।

তিনি (আ.) পার্সেলটি খুললে তাতে একটি টুপি দেখতে পান। সেই হিন্দু ব্যক্তি টুপিটির অনেক প্রশংসা করে। তিনি (আ.) যখন সেই হিন্দু ব্যক্তির মুখে টুপির এত প্রশংসা শোনেন, তখন সঙ্গে সঙ্গেই সেই টুপিটি তাকে দিয়ে দেন।

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলভী (রা.) বর্ণনা করেন, হাজী হোসেন নামের একজন আহমদী ছিলেন, তিনি হজ্জ করে ফেরত আসেন এবং খাঁটি মুক্তার অর্থাৎ একটি মূল্যবান তসবীহ্ নিয়ে আসেন আর সেটি উপহারস্বরূপ হুযূর (আ.)-এর সেবায় উপস্থাপন করেন। *সেটি খাঁটি মুক্তার অত্যন্ত মূল্যবান একটি তসবীহ্ ছিল।* আর সে-সময় অধম (হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলবী) এবং সিয়ালকোটের আরেকজন বন্ধু হুযূরের সমীপে উপস্থিত ছিল। আমাদের সামনেই হাজী হোসেন সাহেব তসবীহ্টি হুযূরের সেবায় উপস্থাপন করেন। হুযূর জাযাকাল্লাহ্ বলেন। সেই তসবীহ্টি ছিল ভারি সুন্দর! তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মনে মনে সংকল্প করি, তার যাবার পরে তসবীহ্টি আমি চেয়ে নেব। আবার সিয়ালকোট নিবাসী সেই বন্ধুও একই ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। হাজী হোসেন সাহেব যখন চলে যান তখন সিয়ালকোটের বন্ধুটি নিবেদন করেন, হুযূর! এই তসবীহ্টি খুবই সুন্দর! তিনি (আ.) বলেন, আপনার যদি পছন্দ হয় তাহলে আপনি নিয়ে নিন, একথা বলে তসবীহ্টি তাকে দিয়ে দেন। আমি নিবেদন করি, হুযূর! এটি নেবার ইচ্ছে তো আমারও ছিল। উত্তরে তিনি (আ.) বলেন, আচ্ছা, তাহলে তোমরা উভয়ে অর্ধেক অর্ধেক করে নাও। পরবর্তীতে সিয়ালকোটের সেই বন্ধু আমাকে বলেন, তসবীহ্ তো একশ' দানারই হয়ে থাকে, তাই এটি আমার কাছেই থাকুক। আমি বলি, ঠিক আছে, তাহলে আপনিই রেখে দিন। এরপর তিনি (রা.) তাকে দিয়ে দেন।

হযরত হেকিম আল্লাহ্ দিত্তাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, সরফরায খান বর্ণনা করেছেন যে, আমরা জলসায় এসেছিলাম। জনৈক ব্যক্তি হুযূরকে একটি মাদি ঘোড়া উপহার দেয়। সরফরায বলেন, আমার মন চাচ্ছিল, এই ঘোড়াটি আমি যদি পেতাম আর আমি এটিকে নিয়ে যেতাম এবং বলতাম, মসীহ্র ঘোড়া আমি নিয়ে এসেছি! বাহনের জন্য বেশ উন্নত জাতের একটি ঘোড়া ছিল। জলসা শেষ হবার পর আমি নিবেদন করি, হুযূর! আমি ফিরে যেতে চাই। হুযূর বলেন, অপেক্ষা করুন। তৃতীয় দিনও আমি আবার একই কথা বললে হুযূর বলেন, চৌধুরী সাহেব! এই ঘোড়াটি নিয়ে যান। আমি নিবেদন করি, হুযূর! এই ঘোড়াটির দাম কত? তিনি (আ.) বলেন, এটিকে ঘাস ও দানা খাওয়াবেন এবং এতে আরোহণ করবেন; এটিই এর মূল্য। কোনো মূল্য লাগবে না। নিয়ে যান এবং আরোহণ করুন।

হযরত মালিক গোলাম হোসেন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, শহীদ মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব আফগানিস্তান থেকে আসেন এবং তিনি (রা.) হুযূরের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। সেবারও তিনি (রা.) অনেক জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিলেন। তিনি (রা.) একটি পোস্তিনও (চামড়ার তৈরি কোট) নিয়ে আসেন। আমি সংবাদ দিলে হযরত সাহেব (আ.) তাকে ভেতরে ডেকে পাঠান। তিনি (রা.) সেসব জিনিস এবং পোস্তিনও হুযূরের সমীপে পেশ করেন। হুযূর (আ.) খুবই খুশি হন এবং বলেন, মৌলভী সাহেব! আপনি অনেক কষ্ট করেছেন। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হুযূর! এই পোস্তিনটি হুযূরের জন্য এনেছি আর মনে চাইছে, হুযূর যেন এটি আমার সামনেই পরিধান করেন। হুযূর (আ.) দাঁড়ান এবং পরিধান করেন। *সেটি ছিল লম্বা একটি কোট বা কোটি কিংবা চোগা অর্থাৎ জোব্বা; যা-ই বলা হোক না কেন।* সেটি গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা ছিল। লম্বা জোব্বাই হবে হয়ত। সন্ধ্যায় খাবার খাওয়ার

সময় খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব নিবেদন করেন, হুযূর! মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব খুবই মূল্যবান, উষ্ণ এবং উন্নত মানের একটি পোস্তিন নিয়ে এসেছেন। খাজা সাহেব এই পোস্তিনটি আগেই দেখেছিলেন। হুযূর (আ.) বলেন, খাজা সাহেব! আপনার খুব পছন্দ হয়েছে, আপনিই নিয়ে নিন। তিনি (রা.) বলেন, হুযূর! আপনার অশেষ অনুগ্রহ! এরপর তিনি (আ.) সেই পোস্তিনটি খাজা সাহেবকে দিয়ে দেন।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) বলেন, লুধিয়ানার হাফেয নূর আহমদ সাহেব পশমি পোশাক বা উলের পোশাকের ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি হুযূর (আ.)-এর নিষ্ঠাবান সেবকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। একবার তিনি তার ব্যাবসায় চরম লোকসানের সম্মুখীন হন আর ব্যাবসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তিনি (রা.) অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে চান এবং অন্য কোনো ব্যাবসা করতে চান যেন নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় তিনি (রা.) নিয়মিত পত্রালাপ করতেন এবং নিজের ক্ষমতা ও সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে গিয়ে জামা'তের আর্থিক সেবা করতেন। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দয়াদাক্ষিণ্য অর্থাৎ অনুগ্রহ, দান, পুরস্কার, দানশীলতা ও বদান্যতা সম্পর্কে আমি শুধু একটি কথাই বলব যে, তিনি (আ.) অল্প দিতে জানতেনই না। তিনি (রা.) নিজের ব্যক্তিগত ঘটনা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, আমার ব্যাবসায় যখন মন্দা দেখা দেয় এবং যখন আমি সেই সফরের সংকল্প করি যে, অন্য কোথাও গিয়ে ব্যাবসা করব, তখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট কিছু টাকা চাই যে, আমাকে কিছু ঋণ দিন যেন আমি ব্যাবসা শুরু করতে পারি। হুযূর (আ.) একটি ছোট্টো বাক্স তুলে নিয়ে আসেন যেটিতে তিনি টাকা রাখতেন, আর আমার সামনে সেটি রেখে দেন যে, যত চাও নিয়ে নাও। আর হুযূর এতে অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। আমি আমার প্রয়োজনানুযায়ী নিয়ে নিই, যদিও হুযূর বারবার বলতে থাকেন যে, পুরোটাই নিয়ে নাও। আসল কথা হলো, বন্ধুদের সাথে তাঁর ব্যবহারই অন্যরকম ছিল। তিনি নিজের সম্পদকে কার্যত বন্ধুদের সম্পদই মনে করতেন এবং এই বিষয়ে তাঁর কষ্ট হতো– যদি কোনো সেবক নিজেকে বহিরাগত মনে করত বা পর ভাবত।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) বলেন, শেখ মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব সারসাবী, আমার বত্রিশ বছরের পুরানো বন্ধু ও ভাই এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রবীণ সেবক। শুরু থেকেই তার স্বভাব ছিল সুফিদের মতো এবং পুণ্যবানদের স্বভাবের প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছিল। তা'লীমুল ইসলাম মাদ্রাসায় শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তিনি শিক্ষক হিসাবে আছেন। প্রথম দিকে তিনিই অতিথিদের খাবার ইত্যাদি খাওয়াতেন; বলতে গেলে তাকে নাযের যিয়াফত বলা উচিত। তিনি এখানে আসার পর থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিশেষভাবে তার প্রতি খেয়াল রাখতেন এবং তার প্রয়োজনাদির সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি নিজেই পালন করতেন। *তিনি তার জামিনদার ছিলেন এবং তার সকল প্রয়োজন পূরণ করতেন।* একবার নানাজান মরহুম হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব শেখ সাহেবের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তিনি তার ঋণ ইত্যাদির একটি তালিকা তৈরি করেন যার মাঝে ময়রাদের থেকে নেওয়া ঋণও ছিল, কিন্তু তিনি জানতেন না যে, তা পরিশোধ হয়ে গেছে। বিষয়টি হযরত সাহেব (আ.) পর্যন্ত গড়ায় যে, তিনি ময়রাদের কাছ থেকে এই ঋণ নিয়ে রেখেছেন লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথা শুনে হাসেন এবং বলেন, আমি এটি জানি এবং সেই ঋণ পরিশোধ হয়ে গেছে। মীর সাহেব!

আপনি চিন্তা করবেন না, বরং প্রতি সপ্তাহে তা পরিশোধ হয়ে যায়। *যে ঋণই করা হোক না কেন, তা প্রতি সপ্তাহে শোধ হয়ে যায়।* হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শেখ সাহেবকে সাপ্তাহিকভাবে অথবা যখনই তিনি চাইতেন, খরচাদি প্রদান করতেন এবং শেখ সাহেব একেবারে নিঃসঙ্কোচে, যেভাবে এক ছেলে বাবার কাছে গিয়ে বলে, বরং তার চেয়েও নির্দ্বিধায় নিবেদন করতেন, এত পরিমাণ খরচ হয়েছে, আর হুযূর সাথে সাথে তা পরিশোধ করে দিতেন। এ ধরনের রাজকীয় ও পিতৃসুলভ বদান্যতা ছিল তাঁর। এর মাঝে ব্যক্তিগত খরচও থাকত এবং নিশ্চিতভাবে লঙ্গরখানার খরচও থাকত।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, হযরত সৈয়্যদ ফযল শাহ্ সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সেবকদের একজন ছিলেন। শাহ্ সাহেব মোকাররম সৈয়্যদ নাসের শাহ্ সাহেবের শ্রদ্ধেয় ভাই ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি হিজরত করে কাদিয়ান চলে আসেন এবং দারুয যিয়াফতে থাকতেন। ১৯০০ সালের জুলাই মাসের ঘটনা, তখন তিনি কাদিয়ানে এসেছিলেন। তিনি ৬ই জুলাই, ১৯০০ তারিখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে ফিরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং এই ইচ্ছাও ব্যক্ত করেন যে, হুযূর, উপদেশমূলক কয়েকটি কথা লিখে দিন। এছাড়াও কিছু ঔষধ এবং একটি কুর্তাও চান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তখন তীব্র মাথাব্যথা ছিল যেজন্য তিনি নামাযেও আসতে পারেন নি, কিন্তু তীব্র মাথাব্যথা থাকা সত্ত্বেও শাহ্ সাহেবের সেই চিঠির উত্তরে তিনি একটি উপদেশপত্র লেখেন এবং ঔষধ আর কুর্তাও দেন। এই ঘটনা এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, তিনি নিজের অসুস্থতার সবচেয়ে তীব্র অবস্থায়ও নিজের সেবকদের ন্যায্য আবদার পূরণের জন্য সচেষ্ট থাকতেন এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও উপকারের জন্য কষ্ট সহ্য করতেও দ্বিধা করতেন না।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব লেখেন, তাঁর (আ.) ব্যবহারিক আমল থেকে এটিও জানা যায়, কখনো কখনো তিনি বন্ধুদের আনন্দের উপলক্ষ্যে অত্যন্ত উদারভাবে অর্থ দিতেন। আর এটি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ এবং বদান্যতার একটি অনন্য দিক ছিল। হযরত মুন্সী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেবের নামে যে চিঠিপত্রগুলো তিনি বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন, সেগুলো অধ্যয়নে এবং স্বয়ং মুন্সী সাহেবের বর্ণনা থেকে এটি প্রমাণ হয় যে, হুযূর (আ.) একবার মুন্সী সাহেবের ওয়ালিমার জন্য এবং দ্বিতীয়বার তাঁর পুত্রসন্তানের আকীকা উপলক্ষ্যে নিজের পক্ষ থেকে একটি বড়ো অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেন আর এই ব্যয়ে তাঁর মাঝে অত্যন্ত আনন্দ ও প্রফুল্লতা লক্ষ করা গেছে। কখনো কখনো মানুষ এই ধরনের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে হুযূরের সমীপে কিছু অর্থ প্রেরণ করতেন এবং লিখে দিতেন, সেখানে আমাদের পক্ষ থেকে দাওয়াতের আয়োজন করে দিন। কিন্তু লেখার সময় তারা এই বিষয়টি বেমালুম ভুলে যেতেন, কাদিয়ানে (অল্প) কয়েকজন মানুষকে দাওয়াত দেওয়া সম্ভব নয়; কারণ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চারপাশে সবসময় অনেক মানুষ উপস্থিত থাকতেন। আর এমনিতে তারা যে অর্থ পাঠাতেন তা অত্যন্ত সামান্য হতো অথবা সবার জন্য যথেষ্ট হতো না। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ে তাদের কিছুই লিখতেন না, বরং নিজের পকেট থেকে বড়ো অঙ্কের অর্থ যোগ করে তাদের ইচ্ছা পূরণ করে দিতেন। আর এমন সুযোগ তাঁর জীবনে বহুবার এসেছে, কিন্তু তিনি কখনো এর উল্লেখ ইশারা-ইঙ্গিতেও করতেন না। বরং এমন অনুষ্ঠানে সবসময় এটিই বলতেন, অমুক বন্ধুর পক্ষ থেকে এই দাওয়াত। কোনো কোনো সময় এটি প্রকাশও পেয়ে যেত; তিনি (আ.) ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের

বলতেন, তার দেওয়া অর্থ কম ছিল বিধায় আমি পূরণ করে দিয়েছি, বাকি খরচ আমি করে দিয়েছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের একটি চিঠিতে হযরত মুন্সী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেবকে তাঁর বিয়ের সময় লিখেছিলেন, আপনার বিয়ে মোবারক হোক। জুমুআর দিন আপনার পক্ষ থেকে অতিথিদের ওয়ালিমার খাবার খাওয়ানো হয়েছে। যেহেতু মেহমান অনেক বেশি ছিলেন, যেমন শেঠ সাহেব অর্থাৎ আব্দুর রহমান মাদ্রাজী সাহেব, শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব (রা.) এবং অন্য অনেক সম্মানিত মেহমান উপস্থিত ছিলেন, আশিজনের অধিক মানুষ হবে, তাই আপনি যে ১০ রুপি পাঠিয়েছিলেন তা যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং এই খুশিতে আমি নিজের পক্ষ থেকে আরও ১০ রুপি যুক্ত করে মোট ২০ রুপির দাওয়াতের ব্যবস্থা করেছি। খুব ভালো খাবার যেমন- পোলাও, জর্দা, কোরমা ও রুটি ইত্যাদি রান্না করানো হয়েছে। যাহোক, এরপর লেখা রয়েছে, মেহমানরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আপনার কল্যাণের জন্য দোয়া করেছেন। মেহমানদেরও এটি জানানো হয়েছে যে, এটি আপনার পক্ষ থেকে দাওয়াত। আমার পক্ষ থেকে বা আমিও এতে শরীক হয়েছি– এমনটি বলি নি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের একটি চিঠিতে হযরত মুন্সী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেবকে তাঁর পুত্রসন্তানের আকীকা উপলক্ষ্যে লিখেছিলেন, দুটি খাসি জবাই করা হয়েছে, যেগুলোর মাংস অত্যন্ত চমৎকার ছিল। আর এক ডেগ মাংসের পোলাও এবং এক ডেগ জাফরান মিশ্রিত জর্দা রান্না করা হয়েছে, রুটি এবং মাংসও রান্না করা হয়েছে। প্রায় সত্তরজনের মতো মেহমান ছিলেন। তাদের আপ্যায়ন করা হয়েছে এবং আপনার পুণ্যময় সংকল্পের বরকতে পোলাও ও জর্দা ইত্যাদি উভয় খাবারই অত্যন্ত সুস্বাদু হয়েছে। আর এটিও লেখেন, এই পুরো কাজটি ২৪ রুপির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে আর আমি যেহেতু জানি, আপনি এত অর্থ দিতে পারবেন না, তাই এর অর্ধেক অর্থাৎ ১২ রুপি যদি পাঠাতে চান তবে যে-কোনো সময় পাঠিয়ে দিতে পারেন। আর তিনি (আ.) অত্যন্ত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং তার দাওয়াতের জন্য তাকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন।

হযরত আহমদ নূর কাবুলি সাহেব বর্ণনা করেন, ১৯০২ সালে আমি যখন কাদিয়ানে আসলাম, তখন মাগরিবের ওয়াক্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার বয়আত গ্রহণ করেন। মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ থেকে আমাকে বাড়ি তৈরির জন্য জমি দান করেন এবং আমার অজান্তেই আমার বিয়ের ব্যবস্থাও করে দেন। আমার অজান্তেই কয়েকজন সাহাবীসহ রুখসাতানার জন্য পাঠিয়ে দেন। আমার জন্য লঙ্গরখানা থেকে এক বস্তা আটা বরাদ্দ করে দেন এবং বলেন, যতদিন আহমদ নূর বেঁচে থাকবে, আমার হিসাব থেকে তাকে এই আটা দিতে থাকবে; আর মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেবকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, আহমদ নূরের এই যে আটার খরচ, তা আমি নিজে বহন করব।

মিয়া আব্দুর রহীম সাহেব বর্ণনা করেন, একবার আমি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হই। আমার বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। অচেতন অবস্থায় ছিলাম। তখন আমার জ্যাঠা মরহুম মীরাঁ বখশ সাহেব, হুযূর (আ.) বুট্টর এলাকা থেকে ভ্রমণ করে ফিরে আসার সময় মোরী দরজার চৌরাস্তায় নিবেদন করেন, হুযূর! আব্দুর রহীমকে দেখে যান; সে ভীষণ অসুস্থ। হুযূরের সাথে আরও কতক সদস্য ছাড়াও হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-ও ছিলেন। হুযূর একান্ত দয়াপরবশ হয়ে দরিদ্রকুটিরে প্রবেশ করেন। আমাকে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে নিজের ডান হাত দিয়ে আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দেন এবং বলেন, কেন অস্থির হচ্ছো? মারা যাবে

না। তখন আমার চোখ খুলে যায়। এরপর হুযূর (আ.) ঘরের ছাদের দিকেও তাকান আর বলেন, আব্দুর রহীম! তুমি এই রোগে মারা যাবে না। তবে এই বাড়ি যা জরাজীর্ণ ও ভগ্ন দশায় আছে, এটিই তোমাকে মেরে ফেলবে। এটির ছাদ চরম দুরবস্থায় আছে। যখন সুস্থ হবে তখন এর ছাদ ঠিক করবে। আর আমার মাকে বলেন, আমার সাথে এসে ঔষধ নিয়ে যান, ঔষধ সেবন করান। আমরা দোয়াও করব। ইনশাআল্লাহ্, সে সুস্থ হয়ে যাবে। অতঃপর আমার মা হুযূরের সাথে হুযূরের বাসায় যান। হুযূর তিন পুরিয়া বা তিন ডোজ ঔষধ দেন। এক পুরিয়া আমি তখনই অর্থাৎ সকাল নয়টা বা দশটা মধ্যে সেবন করি, দ্বিতীয় পুরিয়া সন্ধ্যায় সেবন করি। এই দুই ডোজ সেবনের পর আমি উঠে বিছানায় বসি। তৃতীয় পুরিয়া পরের দিন সকালে সেবন করি। শুধুমাত্র এই তিন পুরিয়া ঔষধ সেবনের পর আমার রোগ পুরোপুরি দূর হতে থাকে। যাহোক তিনি বলেন, পাঁচ-ছয় দিন পর আমি পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করি। সামান্য দুর্বলতা রয়ে যায়। তিনি বলেন, সপ্তাহখানেক পর আমি হুযূরের সমীপে উপস্থিত হই। যাহোক, দুর্বলতা ছিল তাই আমাকে অন্যের সাহায্যে ওপরে নেওয়া হয়। আমি যখন হুযূরের সামনে আসি তখন হুযূর বলেন, তুমি সুস্থ হয়ে গিয়েছ? আমি নিবেদন করি, হুযূরের দোয়া এবং ঔষধের ফলে সেই দিন থেকেই জ্বর প্রভৃতি বিন্দুমাত্র নেই। এরপর হুযূর বলেন, বাড়ির ব্যাপারে কী করলে? আমি নিবেদন করি, মাস-সোয়া মাস অসুস্থ ছিলাম আর আমার কাছে একটি পয়সাও নেই। বাড়ি কীভাবে বানাবো? আমি ছাদ কেমন করে পরিবর্তন করব? হুযূর বলেন, আমরা বানিয়ে দেবো। আর তখনই মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেবকে ডেকে বলেন, আপনি যখন মাদরাসার কক্ষের জন্য কাঠ আনাবেন তখন আব্দুর রহীমের বাড়ির ছাদের জন্যও কাঠ আনিয়ে সেটি বানিয়ে দেবেন। যা খরচ হবে আমরা দেবো। অতঃপর মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব মিস্ত্রী রুকারামকে আমার বাড়ি দেখার এবং কাঠের আনুমানিক খরচ নিরূপণের জন্য প্রেরণ করেন। সে মৌলভী সাহেবের কাছে এসে বলে, বাড়িতে দশটি কড়িকাঠ লাগবে। মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব হুযূরের কাছে নিবেদন করেন, কাঠের জন্য ত্রিশ টাকা লাগবে। হুযূর মৌলভী সাহেবকে ত্রিশ টাকা দিয়ে দেন আর আমার বাড়ি তৈরি হয়। তিনি বলেন, এছাড়াও মজুরি ও অন্যান্য যে খরচ হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমি জানি না– তা কত ছিল। সব খরচ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দিয়েছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, সীরাতে তাইয়্যেবার সোজাসাপ্টা সারাংশ বর্ণনা করে উল্লেখ করেন, আমাদের বড়ো মামা মরহুম হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) আমার বলার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চরিত্র ও গুণাবলি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অত্যন্ত কোমল ও দয়ালু ছিলেন, দানশীল ছিলেন, অতিথিপরায়ণ ছিলেন, ভীষণ সাহসী ছিলেন *অর্থাৎ মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি সাহসী ছিলেন।* বিপদাপদের সময় যখন মানুষের মন দমে যেত, তিনি সিংহপুরুষের মতো অগ্রসর হতেন। মার্জনা করা, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, বদান্যতা, বিনয়, বিশ্বস্ততা, সরলতা, আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর প্রেম, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা, দ্বীনের মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, অঙ্গীকার রক্ষা, উত্তম সামাজিক আচরণ, ব্যক্তিত্বের মর্যাদা, আত্মমর্যাদাবোধ, সাহস, দৃঢ় সংকল্প, সদাহাস্য মুখমণ্ডল এবং উদার ও প্রফুল্ল ব্যবহার– এসবই ছিল তাঁর অনন্য ও উজ্জ্বল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

তিনি লেখেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমার দুবছর বয়স থেকে দেখছি আর তিনি আমার চোখের সামনে থেকে তখন বিদায় নেন *অর্থাৎ তিনি (আ.) তখন*

মৃত্যুবরণ করেন যখন আমার বয়স সাতাশ বছর। কিন্তু আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমি তাঁর (আ.) চেয়ে উত্তম, তাঁর চেয়ে অধিক উন্নত চরিত্রের অধিকারী, তাঁর চেয়ে উচ্চমার্গের পুণ্যবান ব্যক্তি, তাঁর চেয়ে অধিক স্নেহশীল, তাঁর চেয়ে বেশি খোদা ও মহানবী (সা.)-এর প্রেমে বিভোর কাউকে দেখি নি। তিনি (আ.) এক জ্যোতি ছিলেন যা মানুষের জন্য পৃথিবীতে বিকাশ লাভ করেছিল, আর তিনি দয়ার বৃষ্টি ছিলেন যা সুদীর্ঘকাল খরার পর পুনরায় পৃথিবীতে বর্ষিত হয়ে সেটিকে সবুজ-সতেজ করে দিয়েছিল।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব নিজেও নিজের এই সাক্ষ্য প্রকাশ করে বলেন, মীর সাহেব যা বর্ণনা করেছেন– আমি নিজেও তার চাক্ষুষ সাক্ষী। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এসব উচ্চ নৈতিক গুণের অধিকারী করুন, যেগুলো সৃষ্টি করানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে তাঁকে (আ.) আবির্ভূত করেছিলেন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)